International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 38-43
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট : মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্প

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, আসাম, ভারত

Abstract

Mahashweta Devi is the name of a relentless journey, an endless struggle. Her writings refuse to be mere patchwork of fiction caged within the domain of imagination as they break away to chronicle, in all the obduracy, the stark reality –man in his milieu. They centre upon the aborigines, their existential crisis, their lives lived in deprivation of even the basic amenities—food, clothing and shelter. Mahashweta Devi makes use of satire and sarcasm and through these along with the projection of turbulent moments of conflict of interests and emotions; she is able to rip off the mask to lay bare the ugly intention lurking underneath. This article is an in-depth analysis of some of her works: 'Bhat', 'Pindodan', 'Bichon', and 'Sangrokkhon'. It makes a thorough study of the representation of life of the aborigines in these works of hers.

মহাশ্বেতা দেবী এক অন্তবিহীন সংগ্রামের পথিক। তাঁর সৃষ্টিকে শুধুমাত্র সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করা হলে ভুল করা হবে কারণ একজন ঐতিহাসিকের মতোই তিনি তাঁর সাহিত্যে সমাজ ও মানুষকে তুলে ধরেছেন। ১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তির দিনে তাঁর জন্ম। বাবা মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) কল্লোল যুগের একজন বিশিষ্ট্য লেখক। 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে তিনি বাংলা ছোটগল্পে এক নবযুগের সূচনা করেন। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে হাতে খড়ি হয় চল্লিশের দশকে। সেসময় তিনি সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে লিখতেন। কলেজে পড়াকালীন সময়ে বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮) সঙ্গে পরিচয় এবং পরবর্তিকালে ১৯৪৭ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ের পর তিনি বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি সরে আসেন। কিন্তু দারিদ্রতা তাদের সংসার জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় নি। পরবর্তিকালে তিনি দ্বিতীয়বার ১৯৬৬ সালে অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন। কিন্তু সেটিও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, ১৯৭৬ সালে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। জীবনে দুবার ঘর বাঁধলেও জীবনে তিনি সুখী হতে পারেন নি। তারপর থেকে লেখাকে চিরসঙ্গী করে তিনি তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। লেখিকা তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছেন,

> "লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা একমাত্র সেভাবেই, আমার মতে, উত্তরন সম্ভব বৃহত্তর আরও মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোনো আকাশে। আমি বিশ্বাস করি গন ও সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্যায়। ইতিহাসচর্যা, আমার মতে সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক" [১]

সমাজ পরিবর্তিত হয়, সময়ের সাথে সাথে শোষণ প্রক্রিয়াও পরিবর্তিত হতে থাকে, কিন্তু সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ থাকে। সভ্যতার নামে যতদিন উৎপীড়ন থাকবে, ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে এই সংগ্রাম। মহাশ্বেতা যিনি মুণ্ডাদের 'মারাংদাই', (বড়দি), তিনি ভদ্রলোকের – ইতিহাসকেই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁর ইতিহাস নিজেই তৈরি করেন। বিকল্প ইতিহাস তৈরির জন্য তিনি ছুটে যান তথাকথিত সাবলর্টান (নিম্ন বর্গ) নামধারী মানুষদের মধ্যে। তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনাকে ভাগ করে নিতে তিনি ছুটে যান তাদের মাঝে। এই মন্ত্রহীন মানুষদের আধুনিক শিক্ষিত মানুষের সমকক্ষ করার প্রয়াসী হন। তাই তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় সেই সব অখ্যাত মানুষেরা যাদের দিকে শিক্ষিত সমাজ কোনোদিন ভালো করে ফিরেও তাকায় নি। তথাকথিত শিক্ষিতরা তাদের চোর, বর্বর বলে বিবেচনা করে কিন্তু তাদের সমাজের মূল খাতে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হতে দেখা যায় না। এই মন্ত্রহীন মানুষদের সঠিক পথ দর্শাতে মহাশ্বেতা বার বার কলম ধরেন। নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখে তাদের উন্নয়ণের চেষ্টা করেন। আদিবাসীদের উন্নয়ণের লক্ষে তাদের নিয়ে নানা সভা-সমিতি করেন, বিভিন্ন সংঘটন গড়ে তোলেন। এই সংঘটনগুলোর মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে- 'পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা', 'সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা', 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি', 'দলিত জনমুক্তি সংঘটন' প্রভৃতি। নিম্নবর্ণের কথকোবিদ মহাশ্বেতার শতাধিক কণ্ঠে উঠে বলেছে, মন্ত্রহীন মানুষেরা। এই উৎপীড়িত কৃষ্ণমানুষের জীবনের দর্পণে মহাশ্বেতা সভ্যতার ইতিহাসকেই পুর্ণনির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত '১৯৯৩ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে গল্পে তিনি শবরদের জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। এই গল্পের মুখ্য চরিত্র দশানন শবর লক্ষ্য করেছে দিনের পর দিন শহর থেকে একদল মানুষ আসে,

তাদের জীবন নিয়ে গবেষণা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলো জমা হয়, পত্র-পত্রিকায় বেড় হয় কিন্তু তা শুধুমাত্র সুনাম কিংবা ডিগ্রী পাওয়ার জন্য। আদিবাসীদের জন্য তাদের মন্যে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা কিংবা সহানুভূতি নেই। তাদের রিসার্চে আদিবাসীদের কোনো মঙ্গল সাধিত হয় না তাই দশানন শিক্ষিত মানুষদের বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলতে ইচ্ছা করে না। মহাশ্বেতার এই গল্প শুধু পাঠককে সজাগই করে না নির্মম সত্যকে প্রকটিত করে তোলে। গল্পে দশানন আর পর্বত শবর খুঁজে বেড়ায় তাদের জীবনের এই অন্ধকারতম দিকের কারণ; কে বা কারা তাদের এই জীবনের জন্য দায়ী? তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে 'দিকু'রা চিরদিনই তাদের শোষণ করেছে, একদিকে অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আবার অন্যদিকে তাদের শোষণ করেই সমাজের শক্তিধর মানুষে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে কেন্দ্র করে কোনও ইতিহাস রচনা হয় না। একজন বিখ্যাত সাঁওতাল গবেষক আক্ষেপ করে বলেছেন,

> "ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতের ইতিহাস আজ পর্যন্ত আদিবাসীদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসকেও স্বীকৃতি দেয় নি। বড় দুঃখের কথা। ইতিহাসের কাছে চোট বড় নেই, জাতি বিচার নেই। ইতিহাসে লেখা হয় সমাজের দেশের ঘটনা ও কাহিনী। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে অন্যরূপে দেখতে পাওয়া যায়। ওইতিহাসিকেরা লিখে গেছেন রাজরাজাদের, বড়লোকদের বড় বড় কাহিনী। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সেসব জাতি অনুন্নত জাতি বলে গণ্য হচ্ছে , তাদের কথা তাঁরা লিখলেন না। বরং স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, যারা বন-জঙ্গলের বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে তৈরী করল দেশ, বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে তৈরী করল জমি জায়গা, চাষাবাদ করল, মাটি খুঁড়ে খুজে বেড় করল সোনা-রূপা, তারা স্বীকৃতি তো পেলই না বরং ইতহাসে পরিচিত হল বর্বর জাতি বলে। মাথার ঘাম পায়ে পেলে যারা রেলপথ তৈরীর কাজে যোগ দিল, তারা তার বিনিময়ে পেল অকথ্য অত্যাচার। বীরের মত যে জাতি দেশের জন্য প্রাণ দিল, বিদেশী শাসন লুপ্ত করার জন্য তীর, ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি তরোয়াল সম্বল করে কামান বন্দুকে সুসজ্জিত দুধর্ষ ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করল, তাদের কথা লেখা হল 'খন্ড জাতির বিদ্রোহ' কিংবা নিছক একটা স্তানীয় হাঙ্গামা বলে।দেশের প্রতি ভালোবাসা তাদেরো যথেষ্ঠ ছিল এবং তারাও ভারতকে , এ দেশকে সমানভাবে ভালোবাসত, সেটা ঐতিহাসিকরা দেখেও দেখলেন না।"[২]

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' গল্পটি প্রকাশিত হয় অনীক পত্রিকায়, প্রকাশকাল জানা যায় নি। বিছন গল্পের মূল অবলম্বন যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সে দুলন গঞ্জু। বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে রাজপুত লছমন সিং। গল্পটি যে গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত তা হচ্ছে কুরুডা ও হেসাডি। যে গ্রামগুলিতে বৃষ্টির পড়েও ঘাস জন্মায় না। মাঝে মাঝে ফণীমনসার জঙ্গল ও কয়েকটি নিম গাছ। সেই কুরুডা গ্রামের দুলন গঞ্জু বড়ই রহস্যময় জীবন যাপন করে। গ্রামের মানুষরা তাকে একটু আলাদা চোখেই দেখে। কারণ অন্যরা যা করতে পারে না দুলন গঞ্জু তা অনায়াসেই করে দেখাতে পারে। গল্পের প্রতিটি ছত্রে ছড়িয়ে আছে দুলনের নিজের সাথে নিজের লড়াইয়ের এক অবিশ্বাস্য চিত্র। দুলন গঞ্জুর মত ব্যক্তি যারা সমাজে অন্ত্যজ বলে পরিচিত, ব্রাত্য তারা কিভাবে জীবনের সাথে, নিজের সাথে লড়াই করে বেচে থাকে গল্পের পড়তে পড়তে তা ছড়িয়ে আছে। গল্পের পটভূমিতে উঠে এসেছে জরুরী অবস্থার কথা, ভূমিদান প্রসঙ্গের কথা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভূমিসত্ত্ব আইনের মাধ্যমে, জমিদারদের জমি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন। এই কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বিনোদাভাবে জমিদারদের কাছ থেকে জমি সং গ্রহ করে ভূমিহীনদের কাছে বিলিয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর হন। উক্ত গল্পে উঠে আসে সর্বোদয় নেতা ও কর্মীদের কথা যারা লছমন সিংহের মতো ব্যক্তিদের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এই নেতা ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত উপহাসের পাত্র হয়েই থেকে যান কারণ জমিদাররা যে জমি দান করেন তা অনাবাদী জমি। এই জমি দান করলে জমিদারের কোনো ক্ষতি নেই বরং যুগ-যুগান্তরের শোষিত শ্রমিকদের ধরে রাখতে সুবিধা হল। তাই জমিদাররা নিজেদের অনাবাদীকে জমি এভাবেই সাধারণের উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিয়ে ভাবলেন ---

> "জমি দেবার ব্যাপারটি সবার্থ সাধক। বাজাঁ জমি বেরিয়ে গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে নিজেদের খুঁটি আরও শক্ত হলো। শেষপাতে রসগোল্লার মতো সর্বোপরি রইল নিজেকে করুণাময় জানান আনন্দ।"[৩]

সেসময় এরকমই একটি জমির মালিক হয় দুলন গঞ্জু। স্বাভাবিকভাবেই সে সেই জমি নিতে চায় নি। কিন্তু ছোটলোকরা হাতেজমি পেয়েও নিতে চায় না এই চাপের পড়ে জমি নিতে বাধ্য হয়। এই জমিই পরবর্তীকালে দুলন গঞ্জুর জীবনের অন্য এক অধ্যায় শুরু করে। জমির একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যুরূপ বিভীষিকা আর অন্যপ্রান্তে থাকে জীবনের বাঁচার রসদ। আর এটি অন্যরূপে নাম নেয় 'বিছন'।

ফসলি জমি না হওয়া সত্ত্বেও সে বছরে বছরে সরকারের কাছ থেকে ৬০০ টাকার মতো আদায় করে। অন্যের গরু নিজের বলে দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে টাকা নেয় আর পরের বৎসরই বলে গরুগুলি মারা গেছে। সরকারী বীজ আর সার বিক্রি করে সে বিছন আনে। ধীরে ধীরে তার রহস্যময় জীবনের আখ্যান উন্মোচিত হতে থাকে সে স্বীকার হয় লছমন সিংএর। লছমন সিং এর চোখ রাঙ্গানিতেই সে বাধ্য হয় সাধারণ জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। গল্পটির মধ্যে বার বার উঠে আসে প্রতাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। যে লড়াইয়ে হারিয়ে যায় দুলন গঞ্জুর আশেপাশের অনেক ব্যক্তি আর তাদের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েই সে বেঁচে থাকে অনাবাদী জমির উপর ঘর বানিয়ে। বুকের ভিতরে এক রাশ ব্যথা নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। স্বভাবে ধূর্ত সে, কিন্তু বাচার জন্য তার কাছে আর অন্য কোনো রাস্তা থাকে না, তাই ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে জেগে উঠে স্বাধিকার

লড়াইয়ের চেষ্টা। যে লড়াইয়ে হারিয়ে যায় করণ ও বুলাকি। লছমন সিং ঘোড়ায় চেপে এনে তাদের মাটি চাপা দিয়ে যায় দুলনের জমিতে আর তা পাহাড়া দেওয়ার জন্য রেখে যায় তাকে, দিন গড়িয়ে যায় এখানে জন্মায় বুনো গাছ। মানুষের সারে সে গাছগুলি বিশাল আকার লাভ করে। মানুষ বুঝতে পারে না এই জায়গার রহস্য। কিন্তু দুলন বুঝে আর শুধু আক্ষেপ করে, ওরা মরে কেন ধান হয়ে জন্মালো না তাহলে তাদের পেটের ভাতের অভাব হতো না।

ধীরে ধীরে এই পর্ব স্থিমিত হয়ে এলে আবারও তাদের মধ্যে স্বাধিকার চেতনা জাগ্রত হয়। ন্যায্য শ্রমের পাওয়ানা দাবি জানায় আসরফিরা। কিন্তু তখনও তারা স্বীকার হয় লছমন সিংএর গুলির। গ্রামের মানুষের বয়ান অনুযায়ী সেদিন মৃত্যু হয়েছিল এগারো জনের, সরকারী হিসাবে সাতজন, তাদেরও সেদিন রাতের অন্ধকারে এই জমিতে মাটি চাপা দেওয়া হয় আর ধীরে ধীরে দুলনের আত্মার ও মৃত্যু ঘটতে থাকে, জীবনে সত্যের সাথে লড়াইয়ে চিরকালই এভাবে হারিয়ে যায় তারা। ধীরে ধীরে দুলনের ছেলে ধাতুয়া ও এই দলে নাম লেখায়। সুতরাং প্রতিবাদ করতে গিয়ে আবারও হারিয়ে যায় ধাতুয়াসহ কয়েকজন।

দুলন গঞ্জু উন্মাদ হয়ে যায়। কাকুঁড়ে জমিতে দিনরাত পরিশ্রম করে ধান চাষ করে। বিছন ধান। আশ্চর্যজনকভাবে যে ধানগাছ সেখানে সৃষ্টি হয় তা ইতিপূর্বে আর কেউ দেখে নি। একদিন ধীরে ধীরে গাছ বড় হয়। প্রচুর ধান হয় কিন্তু গ্রামের মানুষ আরও আশ্চর্য হয় যখন সে ধান কাটতে দেয় না। বরণ ও আসরকি, মোহা, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুর জীবন থেকে উৎপন্ন এই ধান এটি আর কেউ জানে না। জানে সে একমাত্র, বাস্তবিকই উন্মাদগ্রস্থতা তাকে গ্রাস করে ফেলে, চিরদিন যে মানুষ মাথা তুলে গড়াতে পারে নি তার অন্তরেও জেগে উঠে প্রতিশোধ পরায়ণতা, এক রাত্রে সে পেয়ে যায় লছমন সিংকে। ঘোড়ার পা ধরে জোড়ে টান মেরে ফেলে দেয় তাকে সেই মাটিতে। তারপর পাথর মেরে তাকে হত্যা করে সেও পাথর চাপা দিয়ে দেয়। কেউ জানতে পারে না এই ঘটনার কথা। সাঁওতাল মুণ্ডারা যেমন করে হারিয়ে যায় তেমনি হারিয়ে যায় লছমন সিংও। এভাবে যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার প্রাণের বিনময়ে নিম্নবর্গীয় সমাজ টিকে আছে। রাজপুত জাতি জাতের দোহাই দিয়ে যুগ যুগ ধরে অবিশ্রান্ত শোষণ করে চলেছে এই মানুষদের। আর এই শোষিত মানুষেরা করে চলেছে টিকে থাকার একমুঠো বিছনের লড়াই। কারণ তাদের কাছে ---

"বিছন মানে বেঁচে থাকা।"[৪]

দুলনের কাছে তাই তার ছেলে হয়ে যায় বিছন। সে ছেলে বেচে থাকতে পিতার মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে না। মরে গিয়ে সে ধান হয়ে জন্মায়। দুলনেরও মুখে আসে আশ্চর্যে প্রসন্নতা। সে---

> "সে আস্তে আস্তে মাচানে ওঠে। মনের মধ্যে একটা সুর। অবাধ্য। ফিরে ফিরে আসছে। ধাতুয়া গানটা বেধেছিল। 'ধাতুয়া'– বলতে গিয়ে দুলনের গলা কেপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম বিছন বনা দিয়া।"[৫]

'পিণ্ডদান' গল্পটির মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী কঙ্কাল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষকে সাহিত্যের মধ্যে তুলে এনে তাদের বাস্তব জীবনকে ধরতে চেয়েছেন। গল্পটি একদিকে রয়েছে কঙ্কাল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এক ব্যবসায়ীর চিত্র এবং অন্যপাশে রয়েছে সমাজের অবহেলিত শোষিত এক ব্যক্তি প্রতিনিধির চরিত্র যে ব্যক্তির নাম দশরথ। বিভিন্ন ডোবা থেকে সে কঙ্কাল সংগ্রহ করে আনে। বর্তমানে জীবনে তার একটিই স্বপ্ন কবে সে একটি আস্ত কঙ্কালের মালিক হবে। সংসার সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহ নেই এক ছেলে তাও কোথায় আছে সেটি জানতেও তার বিশেষ আগ্রহ বোধ নেই। তার কাছে যেন জীবন মানেই শুধু বেঁচে থাকা।

গল্পটিতে একদিকে যেমন কঙ্কাল ব্যবসা এবং তার সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষের কথা রয়েছে ঠিক তেমনি উলটো দিক থেকে আমাদের কাছে গল্পটি একটি প্রশ্নচিহ্ন ছুড়েঁ দেয় যে এতো কঙ্কাল সৃষ্টি হয় কেমন করে? তার মানে কি জীবনের কোনো মূল্য নেই? গল্পটিতে আমরা দেখি ---

> "পালবাবু বললেন 'সালা, আড়াই বছরে কতগুলান মরেছে দশরথ? শালার একটা পুষ্কর্ণী বাকি নাই'। বোসবাবু বললেন 'মেরেছে, আর পাথর ইটের খলিতে পুড়ে পাঁকে ফেলেছে দাদা।'"[৬]

একথা শুনে দশরথ হাসে, তার জিভে জল আসে। কঙ্কালগুলি দেখলে তার মনে স্নেহ জাগে। সে সযত্নে তরুণ কঙ্কালগুলিকে চূর্ণ আর ব্লিচিংপাউডার দিয়ে পরিষ্কার করে। পালবাবু আর বোসবাবুর কাছে সে কঙ্কালগুলি তুলে দিলেই টাকা পায় এবং তা দিয়ে সর্বাগ্রে সে মদ খায়। ছেলেগুলি অকালে মরে দেখে দশরথের দুঃখ হয়। সে বলে মৃত ছেলের মা বাবাকে পিণ্ডদান করবে কে? পিন্ডদান এখানে প্রতীক মাত্র। যাদের প্রসঙ্গ এখানে বলা হয়েছে বাস্তবে তারা কোনোদিন মনুষ্যসমাজে স্থান পায় নি, পায় নি বলেই জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ নেই, কঙ্কাল তাদের মনে কোনো অনুভূতির উদ্রেক করে না; মনুষ্যসমাজে তাদের স্থান পিশাচের মতো। কিন্তু এই সত্যটুকু মেনে নেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যখন তাকে পিশাচ বলে গালাগাল দেয় তখন সে ভাবে ---

> "ও তো শুধু কঙ্কাল তুলে, পালবাবুদের দেয়, নিজে কমিশন নেয়। ..... অযোধ্যার কোনো গ্রামে ওর বাড়ি ছিল ..... মেডিক্যাল কলেজে বেওয়ারিশ মড়া শটিত করে শ্বেত শুভ্র কঙ্কাল বের করে নিতে ওর জোড়াছিল না। তখনও রামের মা ওকে ঘেন্না করত, কাছে আসতে দিত না। অথচ দশরথ জানে কঙ্কাল হলো মানব শরীরের স্থির ও পবিত্রতম পরিণতি। আর সবই পচনশীল, অশুচি, অস্থায়ী।"[৭]

রামের মা নেই, তার জন্য দশরথ ভাবেও না। রাম দু'বৎসর থেকে কোন জেলে আছে দশরথ তা জানে না। পালবাবুর কাছ থেকে জানতে পারে রাম জেলে পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে শরীর শক্ত করছে। তার জীবনের সাথে এখন অতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে

খাসির মাংস, মদ ও কুসির 'বিগত ত্রিশ' দেহ। দশরথের বাবার কোনো খবর ছিল না। যেদিন জেনেছে বাবার মৃত্যুর কথা সেদিন সে পিণ্ড দিয়েছে, তার বিশ্বাস রামও দেবে। তবে দশরথ ভাবে ছেলে জেল থেকে বেরোলেই বিয়ে করে সংসারী হতে বলবে। কিন্তু টাকা যেন তার জমতেই চায় না।

একটি নিখুঁত কঙ্কাল খুঁজে পেতে দশরথের অনেক দিন লাগে। দশরথ যাদের টেনে তুলে সেই কঙ্কালগুলির কোন না কোন জায়গা ভাঙ্গা থাকে। সে এও দেখেছে কোন কোন কঙ্কালের প্রতিটি হাড় ভাঙ্গা। পালবাবুর ঘরে সারা রাত বাতি জ্বলে, তিনি ঘুমতে ভয় পান। কেবলই তার মনে হয় দশরথ, নিধিরাম, চৈতন্য তাকে জাগ্রত না পেলে কঙ্কাল নিয়ে চলে যাবে দত্ত রায় বাবুর কাছে, তিনি ভাবেন ---

> "জীবনে যাদের প্রতি নিয়ত ক্রোধ হতো, মনে হতো তারা না জন্মালেও দেশের দশের চলে যেত বেশ, মনে হতো উত্তর- চল্লিশ লোকগুলোর আরও সুখ ভোগের পথে তারা কাঁটা, মৃত্যুতে তারা বড় দামি, জীবনে যারা ঘাতক তাড়িত হয়ে একটি দরজা খোলা পায়নি, মৃত্যুতে তাদের জন্য দরজার পর দরজা খোলা।"[৮]

দশরথ একটি আস্ত কঙ্কালের খোঁজে 'ঔষুধ কোম্পানীর দিঘিতে' যায়। সেখানে ভালো 'মাল' আছে। পালবাবুর কাছে দশরথ তার ছেলের কথা জানতে চায়। দশরথের বাবা ও দশরথকে দেখে নি, সেও রামকে দেখে নি। তাদের পিতা পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু পিণ্ডদানের। সে বিশ্বাস করে ছেলে পিণ্ড না দিলে তার আত্মার মুক্তি ঘটবে না। ওষুধ কোম্পানীর দিঘিতে সে একটি পূর্ণ কঙ্কাল পেয়ে যায়। খুশিতে তার মন ভরে উঠে। পরক্ষণেই তার মুখে জেগে উঠে এক বিচিত্র হাসি। কঙ্কালের গলা থেকে অতি যত্নে সে রূপার হার খুলে। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা 'রামলাল' খোঁদাই করে হারটি তৈরি করেছে। যে মাংসপেশী রক্ত, চুল, চামড়া প্রভৃতি দশরথ এতদিন অপবিত্র বলে জেনেছে আজ তার জন্য তার হৃদয় হাহাকার করে উঠে। যে কঙ্কালকে মনে হতো মানব শরীরের চরম ও পবিত্রতম পরিণতি, তখন তাকেই মনে হলো অপচয়। আর সে পিণ্ড পাবে না ---

> "কত স্নেহে ও কঙ্কালটির পাঁজরা ঝাপটে ধরল, জীবিত পুতকে দশরথ এমন করে আলিঙ্গন করেনি।"[৯]

পালবাবু এই কঙ্কালের জন্য দশরথকে একশ টাকা দিল। টাকা নিয়ে মদ খেতে খেতে সে বলতে থাকে---

> "রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়গছে, তু জানবি কীর ক্যারেও বলতে দিবনা দশরথ অপিন্ডিয়া ছিল।"[১০]

নিম্নবর্গীয় সমাজ ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 'ভাত' নামক ছোটগল্পে। গল্পটি প্রকাশিত হয় 'ম্যানিফেস্টো' পত্রিকায় ১৯৮২ সালে। সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই একদল মানুষ আরেক দল মানুষকে ক্রমশ শোষণ করে চলেছে। এরকমই এক আদিবাসী শোষিত সমাজের প্রতিনিধি উৎসব। যার সমাজ জীবনে ব্যক্তি নামেরও কোন মূল্য নেই। কারণ আমরা দেখি সে আর উৎসব থাকে নি, তার নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় উচ্ছব নাইয়া। গল্পটিতে একদিকে আছে এক সম্পন্ন সংসার আর অন্যদিকে রয়েছে চির-নিরন্ন মানুষের অবশ্যম্ভাবী অবুঝ সংঘাতের গল্প। পরিবারের কর্তার ক্যান্সার। তিনি মৃত্যু শয্যায়। চিকিৎসা এবং তান্ত্রিকের হোম-দুই-ই চলেছে। বড় সংসার, কাজ অনেক। এমন একটি পরিবারে বাসিনীর হাত ধরে উচ্ছব নাইয়ার প্রবেশ যার জীবনে শুধু রয়েছে ভাতের জন্য হাহাকার। বড়লোকের বাড়ীতে বাদা থেকে চাল আসে, অনেক লোক যায়। হাভাতে উচ্ছবের চোখে ও কানে যা দিতে থাকে রকমারি চাল ও নানা ধরনের বিলাসী খাদ্যের সমাহার। মানুষ যে এত সুস্বাদু খাওয়ার খেতে পাবে উচ্ছবের কাছে তা অকল্পনীয়। মহাশ্বেতা বাবুদের জীবন চিত্রণের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি এখানে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ---

> "ঝিঙে শাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজো আর ছোটর জন্য বারমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন-চাকর-ঝি দের জন্যে মোটা সাপটা ভাল।"[১১]

উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি ব্যাঙ্গাত্মক শ্লেষ। কারণ পরমুহূর্তেই উচ্ছবকে আমরা বলতে দেখেছি ---

> "বাদায় এদের চাল হয়।! তা দেখি বাসিনী। এক মুষ্টি চালই দে। গালে দে জল খাই। ..... সেই কদ্দিন ঘরে আঁদা ভাত খাই না। দে বাসিনী, ব্যাগ্যতা করি তোর।"[১২]

উৎসবের সবই ছিল। সাজানো সংসার, স্ত্রী সন্তান সবই ছিল কিন্তু বিধি কম। যাদের কেউ নেই তাদের হয়তো ভগবান ও সব সময় রক্ষা করেন না। তাই এক ঝড়জলের রাতে সে হারিয়ে ফেলে তার স্ত্রী, সন্তানকে, ডাঙা ঘরের মাঝের খুঁটিটি ধরে সে সেদিন অনেক ভগবানকে ডেকেছিল। কিন্তু ঝড়ের শেষে যখন তার জ্ঞান ফিরে বসে "রা কাড় অ চন্নুনির মা।" কিন্তু কোথাও সারা পায় নি। জমির স্বপ্ন দেখে একটি দরখাস্ত করেছিল সে কৌটোটাও আর খুঁজে পায় নি। লেখিকা যেন এক ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিতে উচ্ছবের পরিচয় দিয়েছিল ---

> "উচ্ছব নাইয়া / পিং হরিচরণ লাইয়া / সে কৌটাটা-বা কোথায়?"[১৩]
>
> তান্নিক ব্রাহ্মণ বিধান দিয়েছেন - যতসময় যজ্ঞ চলবে ততক্ষণ বাড়িতে কেউ কিছু খেতে পারবে না। উচ্ছবের ক্ষুধা উঠতে থাকে। তারপর পূজো শেষ হবার ঠিক পরেই রোগশয্যায় মুমূর্ষু কর্তা চোখ বোজেন। নতুন শাস্ত্রীয় বিধান জারি হয় - অশৌচের বাড়িতে যা কিছু রান্না করা খাবার - ফেলে দিতে হবে সব। স্বল্পবুদ্ধি উচ্ছব যখন বুঝে ফেলে দেওয়া হবে সব ভাত, তখন তার অন্তরাত্মা আহত আর হিংস্র হয়ে উঠে। ক্ষুধার্ত পেট তান্ত্রিকের রক্ত চক্ষুকে মানতে চায় না। তার কাছে তাই শৌচ বা অশৌচ বলে কিছু নেই। বাসিনি বার বার তাকে বুঝাতে চেষ্টা করে 'অশুচ বাড়ির ভাত খেতে নি দাদা।' কিন্তু বাসিনী যত না করে সে

> ততো হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পিতলের বিশাল অন্নপাত্রটি নিয়ে সে ফুটে চলে যায় সকলের নাগালের বাইরে। স্টেসনে এসেভসে আকণ্ঠ ভাত খায় এবং নিরন্ন পেটে ভাতের ডেগ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভাতে হাত ঢুকিয়ে সে যেন স্বর্গমুখ পায়। তার মনে হয় চন্নুনির মাও যেন তাকে জীবনে এত সুখ দিতে পারে নি। যদিও সে রহস্যময় অন্নসত্র অদেখা চালের বাদাটির সন্ধান করতে চেয়েছিল সে, সেই সন্ধান তার আর হয় না। বড়লোকের বাড়ির খাওয়া-মাখা মানুষেরা ভাতের হাঁড়ি চুরি করার অপরাধে তাকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যায়। কোন পক্ষই অপরপক্ষকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। "আসল বাটার খোঁজ করা হয় না আর উচ্ছবের। সে বাদাটা বড়ো বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।"[১৪]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতাতেবলিখেছিলেন 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে / কারো যেন আজও ভাত রাঁধে/ ভাত বাড়ে, ভাত খায়/' একই সহমর্মিতা নিয়ে আঁকাড়া ভাত হয়ে উঠেছে দুই লেখকেরই শিল্পের উৎস আর শিল্পীত প্রতীক-দুই-ই। মহাশ্বেতা দেবীর ভাত কেন্দ্রীক গল্পে একটি প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়শই অন্নবুভুক্ষ মানুষেরা সেই অন্ন বা চাল করায়ত্ত করেছে যা মৃতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যে অন্ন শাস্ত্রীয় বিধানে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ক্ষুধার্ত পেট শাস্ত্র মানে না। এইভাবে বেঁচে থাকার যুক্তি শাস্ত্রীয় বিধানকে নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে যায়। আমাদের মনে পড়ে আরও দুটি গল্প – 'সাঁঝ সকলের মা' এবং 'জাতুধান', 'সাঁঝ সকলের মা' গল্পে দেখি সাধন তার মায়ের শ্রাদ্ধে চাল দিয়েছিল কিন্তু শ্রাদ্ধশেষে পুরোহিতের পাওনা চালগুলি গামছায় বেঁধে, 'চুকে শালা' বলে গাল দিয়ে- সে চলে আসে। বন্ধু বলরাম শাস্ত্রবাক্য বলেও তাকে বোঝাতে পারে না। কোনো যুক্তিই কানে তোলে না সাধন। 'জতুধান' গল্পে একদিকে রয়েছে সাজুয়া তিত্তর এর বিশাল দেহ এবং অন্যদিকে অ-মানুষি ক্ষুধার কথা। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই খিদে মহাশ্বেতার গল্পে একটি অনন্য থিম হয়ে দাঁড়ায় । এধরণের ধ্রুপদী থিম মহাশ্বেতার সাহিত্য বিশ্বকে একটি অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সংরক্ষণ' গল্পটি ১৮৮৯ সালে 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে জঙ্গলের প্রতি আদিম আদিবাসীদের এক গভীর প্রেমের চিত্র অংকিত হয়েছে। 'হো', 'লোধা', 'সাঁওতাল' তারাই জঙ্গলের আদি আদিবাসী। জলের অন্যান্য প্রাণীর মত তারাও আজ বিপন্ন। একদা যে মানুষগুলির খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ভাবতে হত না আজ তারা নিরুপায়। শহুরে বাবুদের আক্রমণে বিপর্যস্ত এই মানুষগুলি তাদের আদিম জীবনকে ভুলতে পারে না। যুগ যুগ ধরে তারা এই জঙ্গলের আদি বাসীন্দা। সিংভূমের আদি অরণ্য এলাকা একসময়ে শাল, বাঁশ, অর্জুন, ধ, সিধা, সিশম ও নানাবিধ গাছে সুশোভিত ছিল। আদি অরণ্যদেবী এই বনে বিহার করতেন। তিনি অরণ্যের অন্ধকারের মতো শ্যামল কালো, তার মেঘের মতো চুল তার লজ্জা নিবারণ। তিনি অনার্য সভ্যতার মতো প্রাচীন। এই কথাগুলি অরন্যবাসীরা সবাই জানে।

মারকান্দা থেকে তেরশো, ভীমাবরু থেকে মেঘাবলহাতো, বোমাইকোচা, মেদিনীপুর প্রভৃতিকে ডিঙিয়ে হাতির দল কয়েকবছর পরপরই আসত আষাঢ়ার বিবির জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে রয়েছে আষাঢ়া দহ। বর্ষায় যার জল ঝাঁপিয়ে পড়ে আশে পাশের অঞ্চলগুলিতে। সেই দহ যে কত গভীর, কোন যুগে যে তার সৃষ্টি তা ভূ-তাত্ত্বিকরাও জানেন না। সেই জঙ্গলে হাতিরা শিশুর জন্ম দেয়, পালন করে আবার সেখান থেকে চলে যায়। যাওয়ার পথে যেখানে আদিবাসীরা জঙ্গল কেটে শষ্যক্ষেত তৈরি করে তা খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে। মানুষ থেকেও এরা জঙ্গলের প্রাচীন অদিবাসী। মাঝে মাঝে ওরা শষ্যক্ষেত্রে নেমে ধান নষ্ট করলেও কেউ বাধা দেয় না। শহুরে বাবুরা এই হাতিদের সহ্য করতে পারে না। তারা বন্দুক দিয়ে মারার চেষ্টা করে। এই হাতিরা অরণ্যের আদিবাসীদের গন্ধ দিয়েই চিনতে পারে---

> "শবররা যুগ যুগান্তের, হো-মুন্ডা, মাহালি-সাঁওতাল-ওঁরাও-কোরা-লোধা-খেড়িয়া এমন সব অরণ্যসন্তানরা যুগ যুগান্তের, হাতিরা সেই দৃষ্টিগোচর আদিম অরণ্যকার শরণাগত সন্তান। হাতিদের পরিক্রমা পথে এসব মানুষের অস্তিত্ব অরণ্যের অস্তিত্বের মতোই। ওরা আসে এরা থাকে।"[১৫]

হাতিরা কেন আসে বালকরাম শবর ভেবে পায় না। তার মনে প্রশ্ন জাগে এরা কি রাস্তা ভুল করে না? যে প্রশ্ন একদা ছোট্ট বালকরাম জিজ্ঞেস করত আজ সত্তর বছর পর তার পৌত্র নিতাই ও একই প্রশ্ন করে। বালকরামের কাছে এই হাতিরা দেবতা কিন্তু নিতাই কি সত্তর বছর পর তার পৌত্রকে বলতে পারবে হাতিরা কি তখনও আসবে? বালকরাম বলে যদি এই হাতিরা না আসে তবে বুঝবে এই পৃথিবী আর বেশিদিন নেই। এক জীবনে সে কত বনের গাছ ধনের গাছ হতে দেখেছে। এত খুন-লড়াই, ট্রেন আসছে। লড়ি আসছে, পৃথিবী কি তার আর ভার বইতে পারে। কিন্তু দিন পরিবর্তিত হয়ে যায়। একসময়ে অগ্রহায়ন মাসও চলে যায় 'হস্তিযূথ' আর আসে না, একদিন নিতাই গভীর উত্তেজনায় এসে বলে—'একটা দাঁতাল মদ্দা গো দাদু একা আসছে'। হাতিটি দলবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করে খোঁজতে থাকে তার প্রাচীন অরণ্যভূমিকে। কিন্তু কোথায় গেল সেই আদিবাসী গ্রাম; আজ চারদিকে শুধু কলাবাগান আর রাস্তা। গল্পটিতে মহাশ্বেতার অরণ্য এবং অরণ্যবাসীর প্রতি গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাই বলেন এই অরণ্য সংকুচিত হতে শুরু করে মারকান্দা থেকে। জঙ্গলের প্রাচীন প্রাচীন গাছগুলিকে মানুষ সমূলে ধ্বংস করে চলেছে। জঙ্গলের আদিম অদিবাসীরা তাদের চেনা পরিচিত মানুষের এখন আর গন্ধ খুঁজে পায় না। এরা চেহারায় চেনা অন্য মানুষ, গায়ে মানুষ বদলে হায়নার গন্ধ। এরাই জঙ্গলের মধ্যে ইউকেলিপ্টাস গাছ রোপণ করে চলেছে। বন্য কায়েথবেল, মাতুলা আর বৃহৎ শিষম গাছ কোথাও নেই। এখন শুধু কাঁটাঘেরা ইউকেলিপ্টাসের নার্সারি। গোলালি ও কোচোংগা গাছের ঘন বন যার নীচে হাতিরা ছায়াপথ, প্রাচীন বট যেখানে হস্তি শাবকেরা গা ঘষাত আজ সব নিশ্চিহ্ন আজ সেখানে বৃহৎ চওরা রাস্তা। "অরণ্যের অধিকার" শব্দটি আজ খুব বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে সারা বিশ্বেই। সমস্ত বিশ্বজুড়েই আজ আমাদের লোভে অরণ্য প্রতিনিয়ত ধ্বংস হয়ে চলেছে। মানুষের লোভে পড়ে বন্যপ্রাণী, প্রকৃতি সবকিছু

বিপন্ন।ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য উপজাতি, যাদের জীবন আজ বিপন্ন। সমাজের ধনীদের শোষণের কবলে পরে বার বার তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে সামিল হতে হয়েছে। চুয়াড় বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি বিদ্রোহে তারা বারবার হারিয়েছে তাদের আপনজন, যার মূলে রয়েছে সমাজের তথাকথিত সেই সব শোষকেরা। অরণ্যই তাদের মা। বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৭৬) 'মা' 'নারীমেধ', 'বধূবরণ', বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) 'বুধনী' মনীশ ঘটকের (১৯০২-১৯৭৯) 'পটল ডাঙার পাঁচালী', সতীনাথ ভাদুড়ির (১৯০৬-১৯৬৫) 'আন্টাবাংলা', অসীম রায়ের (১৯২৭-১৯৮৬) 'সুন্দর' প্রভৃতি গল্পে আমরা আদিবাসীদের কথা ওঠে আসতে দেখি কিন্তু মহাশ্বেতার মত কারো রচনায়ই তা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই আদিবাসীরা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সব কিছু থেকে বঞ্চিত। এমনকি সময়ে তারা ফেন পর্যন্ত কিনে খাওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তিনি তীক্ষ্ণ শ্লেষে, বিদ্রূপে, উত্তেজনায় মানুষের ভেতরের চেহারার উন্মোচন করেছেন। তার গল্পের চরিত্ররা নিজেই নিজের সমস্যা খুঁজে বেড়ায় এবং প্রতীকি চরিত্র হয়ে ওঠে। মহাশ্বেতা বলেছেন-

> "আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বারবার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The voiceless of Indian Society. এই অংশ এখনও শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নত শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ই বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না ।"[১৬]

তথ্যসূত্রঃ

১. দেবী মহাশ্বেতা, 'ভূমিকার পরিবর্তে', শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাব্লিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ৯
২. বাস্কে ধীরেন্দ্র নাথ, 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস', বিজয়ন প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, মে ২০০৩, পৃঃ ০১
৩. দেবী মহাশ্বেতা, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃঃ ১৬১
৪. তদেব, পৃঃ ১৭৮
৫. তদেব,পৃঃ ১৭৮
৬. তদেব,পৃঃ ৪৬
৭. তদেব,পৃঃ ৪৭
৮. তদেব,পৃঃ ৪৭
৯. তদেব,পৃঃ ৪৯
১০. তদেব,পৃঃ ৪৯
১১. তদেব,পৃঃ ২১৩
১২. তদেব,পৃঃ ২১৩
১৩. তদেব,পৃঃ ২১১
১৪. তদেব,পৃঃ ২১৬
১৫. তদেব,পৃঃ ২৬৫
১৬. মুখোপাধ্যায় সোমা সম্পাদনা,মহাশ্বেতা দেবী: নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃঃ ৭

*****